***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***UGC Enlisted Serial No. 48666***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 124-134*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# বাংলায় ‘তেভাগা আন্দোলন’ ও সলিল চৌধুরীর গণসঙ্গীতঃ ফিরে দেখা

**Dipta Sundar Mondal**
*B.Ed. Teacher Trainee, University of Calcutta (Fakir Chand College), W. B., India*

***Abstract***

*The ‘Tebhaga Movement’ erupted in 1946 in Bengal on the eve of the withdrawal of the British in India. The tide of Tebhaga uprising stands out as one of the most important political events in twentieth century Bengal. ‘Tebhaga’ literally means 'three shares' of harvests. The Tebhaga Movement was led by the share croppers of the Bengal region against the oppressive jotedars in 1946-47. The movement resulted in clashes between Jotedars and Bargadars. Seeing the plight of the farmers Salil Chowdhury started to write Mass Songs. A Mass Song is a type of song which is written for individual or chorus singing and intended for broader masses. He was not only an outstanding composer, an accomplished and gifted arranger, poet and writer but above all an intellectual. During this period Salil Chowdhury wrote numerous songs and with Indian People’s Theatre Association (IPTA) comrades took his songs to the masses. They travelled through the villages and the cities and his songs became the voice of the masses. In fact, Salil Chwdhury always retained his strong feelings for the social injustice and very often wrote songs which reflected those feelings. He called these songs ‘The Songs of consciousness and awakening'. These mass songs also became a part of the independence movement and they are still performed all over Bengal after all these years. In a way they have now become an integral part of the Bengali heritage. We have six songs that Salil Choudhury composed for the peasant movements and the Tebhaga Movement. Many more of songs have references or allusions to the Tebhaga Movement. In this paper, an attempt will be made to make an empirical analysis on the Mass Songs which were composed by the musical genius Salil Chowdhury, especially during the period of Tebhaga Movement (1946-50) and also put a light on the impact of those Mass Songs on the peasants moreover on the society during the first half of twentieth century Bengal.*

***Keywords:** **Bargadars, Bengal, Indian People’s Theatre Association, Jotedars, Krishak Sabha, Lyricist, Mass Song, Music Composer, Salil Chowdhury, Share-cropper, Tebhaga.***

মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের এক জ্যোতির্ময় অধ্যায় তেভাগা আন্দোলন।অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৬৪৭ এবং --উভয় বাংলায় উত্তরউপনিবেশকালে গড়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ জনতার অংশগ্রহণে পরিচালিত তেভা(৪৯-১৯৪৮)

-ভয় বাংলায় উত্তরউপনিবেশকালে গড়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ জনতার অংশগ্রহণে পরিচালিত তেভাগা (৪৯-১৯৪৮) কৃষক সংগ্রাম এক ঐতিহাসিক গণআন্দোলন রূপে আজ ইতিহাসের পাতায় যথাযোগ্য মর্যাদার স্থান পেয়েছে।আজ অর্ধেক শতাব্দীর বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর, এই মুহূর্তেও এ দেশের কৃষিজীবী মানুষের নিজের জমি আর ভূমিজ ফসলের ওপর যে অধিকার রয়েছে তার দৃঢ়তার পিছনে এক ঋজু স্তম্ভ বাংলার তেভাগা আন্দোলন। ব্রিটিশের নিকট থেকে ভারতের মুক্তি আন্দোলন যখন শেষ পর্যায়ে ঠিক তখনই বাংলার মাটি রঞ্জিত হয় কৃষকদের তাজা রক্তে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এক নতুন ধরণের জমিদারশ্রেণীর পত্তন হয়, যাঁদের জমির সঙ্গে মূল সম্পর্ক ছিল ব্যবসাভিত্তিক, বৃটিশ শাসককে নির্ধারিত খাজনা দেওয়ার পর বর্গাদারের থেকে আদায় খাজনার সম্পূর্ণ লভ্যাংশ তাদেরই থাকতো। এই লাভের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার জন্য চলতে থাকত নিজের জমিদারির মধ্যে চাষীদের অপর অনিয়ন্ত্রিত অত্যাচার। ১৯২০ সাল থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষকরা করমুকুব, করছাড়ের আন্দোলন করতে থাকেন।পাঞ্জাবে গদর পার্টির নেতৃত্বে, গুজরাটে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কর মুকুব করার দাবি নিয়ে কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকেন। ১৯২৯এ 'বিহার প্রাদেশিক কিষাণসভা' এবং ১৯৩৬ এ 'সারাভারত কৃষক সভা' (All India Kisan Sabha) প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলতঃ এই সময়টা দিয়ে কৃষকরা উপলব্ধি করতে থাকেন যে শুধুমাত্র দুর্যোগের বছরগুলিতে করহ্রাসের লড়াই দিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা অর্জন করা যাবেনা। প্রয়োজনে জমিদারদের তৈরি করা নিয়ম গুলি বদলানোর দাবি উথতে থাকে কৃষকদের মধ্যে।বর্গাদার ও ভাগচাষীরাও এতে যোগদান করেন সম্যক ভাবে।উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ ফসল পাওয়ার দাবিতে শুরু হয় গণ কৃষক আন্দোলন।[১] ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ফসলের ওপর প্রজার অধিকার নিশ্চিত করতে প্রজারাই এগিয়ে আসেন। চিরকল্যাণময়ী বাংলার মাটিতে গাঁথা হয় তেভাগা আন্দোলনের উপকথা যার উপসংহারে লেখা থাকে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের ভবিষ্যৎ।

বাংলার মাটিতে আধিয়ারদের[২] অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ জ্বলতে শুরু করে তিরিশের দশকের শেষভাগ থেকেই। কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহের নেতৃত্বে ১৯৩৭ সাল নাগাদ ময়মনসিংহের চাষিরা ধানে খাজনা দেওয়ার পদ্ধতি 'টংক প্রথা' বিরোধিতা করে সংগঠিত হন। ক্রমে টংক ও আধিয়ারদের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলনে নামতে থাকেন বাংলার বাকি অংশের ভাগচাষী ও বর্গাদার চাষিরা। এই পরিস্থিতিতে ফজলুল হক মন্ত্রীসভার 'ভূমি রাজস্ব কমিশন' (ফ্লাউড কমিশন) নিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন (Floud Commission) সময়ের দাবিকে স্বীকৃতি দিয়ে, ভাগচাষী ও বর্গাদারদের উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ফসল গ্রহণের কথা সুপারিশ করে। কিন্তু প্রত্যাশা মতই সেই সুপারিশ কার্যকর হয়না এবং চাষীরা স্লোগান তোলেন তেভাগা মতে উৎপন্ন ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে লড়াইয়ে নামবার।[৩] ১৯৪০ সাল থেকেই খুলনার কৃষকরা তেভাগার অতিরিক্ত ফসল খাজনা দিতে অস্বীকার করেন এবং ধান কেটে নিজের গোলায় তুলতে থাকেন। জমিদারের লেঠেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে থাকে তাঁদের, পুলিশ এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় কৃষক পরিবারের সকলকে, আর এই পরিস্থিতিতে তেভাগার সংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কৃষক সভা সর্বদাই চেয়েছিল সকল পর্যায়ের কৃষকদের আন্দোলনে সামিল করতে। কৃষক সভা ১৯৪০ সালে পাঁজিয়া সম্মেলনে সর্বপ্রথম তেভাগার দাবি তোলে ও প্রচারও শুরু কর।[৪] জমিদারের লেঠেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে থাকে তাঁদের, পুলিশ এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় কৃষক পরিবারের সকলকে, আর এই পরিস্থিতিতে তেভাগার সংগ্রাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৯-৪০ সালে উত্তরবঙ্গে জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রথম লড়াই শুরু করেছিল সম্পন্ন আধিয়ার ও ছোট মালিক চাষিরা বললেও তেভাগা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল সাধারণ বা প্রায় নিঃস্ব ভাগচাষী ও বর্গাদাররাই।[৫]

খুলনার মৌভোগে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে সারা বাংলা জুড়ে তেভাগা আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দাবি করা হয় বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ।কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এই আন্দোলন ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। তারা এই আন্দোলনকে একপ্রকার গণআন্দোলন বা 'Mass Movement' এ পরিণত করতেচেয়েছিলেন।[৬] তেভাগা লড়াইয়ে সার্বিকভাবে মানুষের অনমনীয় প্রতিবাদ তার বিশাল ও বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। তৎকালীন বাংলার ২৫টি জেলার মধ্যে ১৯টি জেলার ২৯টি মহাকুমায় সংগঠিত হয়েছিল কৃষকদের মহাসংগ্রাম তেভাগা আন্দলন।দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা,যশর, ফরিদপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, নদিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ এবং জলপাইগুড়ি জেলার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলে আন্দোলনের দাবানল।[৭] সব মিলিয়ে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি এবং কৃষকসভার নেতৃত্বে সারা বাংলার সংগ্রামী মানুষ নিজেদের আন্দোলনের সঙ্গে এক করে ফেলেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে গেছেন সাম্রাজ্যবাদীশোষকদে-সামন্তী শাসক-র বিরুদ্ধে। মুক্তাঞ্চলে গড়ে তুলেছিল নিজ নিজ প্রসাসন। মহিলা এবং আদিবাসীরা নেতৃত্বে উঠে এসেছিলেন আর জনগণের মধ্য থেকে দাবী এসেছিল যৌথখামার, ফসলের সামাজিক সঞ্চয় গড়ে তোলার। (পুঁজ) ঘরে ধান আসায় কিষাণীরা নিজেদের ও সন্তানদের জন্যে শিক্ষার দাবী করতে থাকেন পার্টির কাছে।

বাংলার ইতিহাস কিষানের রক্তে, ঘামে, কান্নায় সিঞ্চিত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর হয়ে যখন স্বদেশীয় ক্ষুদে শোষক জোতদার-জমিদার-মহাজন নিজের দেশের গরিব অসহায় মানুষকে ক্ষুধার অন্ন থেকে বঞ্চিত করেছে ঠিক তখনই এই অবমানিত, লাঞ্ছিত কৃষক সমাজ অবিচার, প্রতিবাদ, প্রতিরোধে গনবিদ্রোহের উৎসার ঘটিয়েছে।শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক আদর্শবাদী মানুষ তেভাগা আন্দোলনে সাড়া দেন।বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজ গ্রামে গ্রামে গেলেন কৃষকদের সংগ্রামে সামিল হতে।নিজেরদের শ্রেণী অবস্থান ভুলে তাঁরা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায়। তেভাগাকে কেন্দ্র করে সংগ্রামী আবেগের এক লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছিল মধ্যবিত্ত ও কৃষক উভয় সমাজেই, যার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তৎসময় রচিত বেশ কিছু গানে ও কবিতায়। চল্লিশের বাংলায় কৃষক আন্দোলন, সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে সর্বোপরি গণমানুষকে উদ্দীপ্ত করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই সর্ববৃহৎ গণ কৃষক অভ্যুত্থানের শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও সুরকার তথা গণসঙ্গীতের প্রবাদপুরুষ হলেন সলিল চৌধুরী (Salil Chowdhury: ১৯ নভেম্বর, ১৯২২- ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫)৷ তিনি মধ্য চল্লিশের দশক থেকেই মেহনতী মানুষের সংগ্রামকে উপজীব্য করে গান বিশেষত গণসঙ্গীত রচনার মাধ্যমে নাচিয়ে দিয়েছিলেন  সংগ্রামী মানুষের মন৷ সে সব গানে মানুষের নির্জীব চেতনা, ঘুমন্ত বিবেক, নতুন বিদ্রোহে জেগে উঠেছিল সম্যক ভাবে।

প্রথমে বলা যাক গণসঙ্গীত আসলে কেমন। 'গণসঙ্গীত' বা 'Mass Song' হল সঙ্গীতের একটি ধারা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে গণমানুষকে উদ্দীপ্ত করার গানই হলো 'গণসঙ্গীত'।[৮] গণসঙ্গীত যে কোনো সুরে আঞ্চলিকতা সহকারে গাওয়া যায়। যে কারণে গণসঙ্গীতের গণমুখীনতা সবার চেয়ে ভিন্ন। আমাদের লোকসঙ্গীতের ধারার সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে গণসঙ্গীত। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত গণসঙ্গীতকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'গণসংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ লোকসঙ্গীতের ধারাটি গণসঙ্গীতেরই অন্তর্গত, কিন্তু গণসঙ্গীত মাত্রই লোকসঙ্গীত নয়। গণসঙ্গীত কথাটা অনেক বেশি ব্যাপক। লোকসঙ্গীত সুরে ভঙ্গিতে ও বাক্য বিন্যাসে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে সীমাবদ্ধ।'[৯] সঙ্গীতের আগে 'গণ' যুক্ত হয়ে 'গণসঙ্গীত' শব্দটি নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে নতুন একটি সাংস্কৃতিক নিশানাকে চিহ্নিত করার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিল। যে ব্যাপারে আরো খোলাসা করে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেন, 'গণসঙ্গীত মানুষের সচেতন জীবন সংগ্রামের ফসল। বলা যেতে পারে জাতীয় চেতনার ধারা যেখানে আন্তর্জাতিক, মেহনতী মানুষের আন্দোলনের সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগর সঙ্গমে গণসঙ্গীতের উৎপত্তি'। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বলেন, 'গণসঙ্গীত মানুষকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে না বা সুখে বিভোর করে তোলে না বরং জেগে উঠে মানুষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উৎসাহ

দেয়'।[১০] সমাজতান্ত্রিক চেতনায় ঋদ্ধ গণসঙ্গীত যা বুর্জোয়া সমাজ কাঠামোতে তৈরি তা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল। সেই শুরু তারপরে সংগ্রামের আর শেষ হয়নি, বেরিয়ে এসেছে নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামে সহযোদ্ধা হয়ে।

বাংলায় গণসঙ্গীতের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৩ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'[১১] (Indian People's Theatre Association বা IPTA) প্রতিষ্ঠার মাদ্ধমে। এই সময় বাংলায় গণসঙ্গীত এক অনন্য ও ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করে।চল্লিশের দশকে প্রারম্ভিক কালের সৃজনশীল ধারার গণসঙ্গীত এক পর্যায়ে উপমহাদেশের বাংলা গানের প্রখ্যাত গীতিকার ও সুরকার সলিল চৌধুরীর হাতে পড়ে এক নতুন রুপ নেয়।তিনি নতুন ধারার গণসঙ্গীত রচনা করেই বসে থাকেননি, তাঁর রচিত গণসঙ্গীত ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের সাথে সম্যক ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কৃষকদের প্রেরণা জোগানোর সাথে সাথে আন্দোলনে নব প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।

সলিল চৌধুরী ছিলেন একাধারে বিপ্লবী, কবি, সঙ্গীত পরিচালক, গীতিকার, সুরকার এবং গল্পকার।দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর অঞ্চলের গাজিপুরে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা জ্ঞানেন্দ্রময় চৌধুরী, আসামের লতাবাড়ি চা বাগানে ডাক্তারি করতেন। বাবার কাছেই সলিল চৌধুরীর সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি। পিতৃব্য নিখিল চৌধুরীর কাছেও সংগীতের তালিম গ্রহণ করেন তিনি। মূলত নিখিল চৌধুরীর ঐক্যবাদন দল 'মিলন পরিষদ'-এর মাধ্যমেই গানের জগতে শৈশবে সম্পৃক্তি। তাঁর গুণগ্রাহীদের কাছে তিনি 'সলিলদা' বলেই পরিচিত।[১২] তেভাগা আন্দোলন শুরু হবার আগে থেকেই সলিল চৌধুরী কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাধরী নদীর বন্যার ত্রাণ কাজে ধর্মতলার রিলিফ কমিটির সাহায্যে গ্রামবাসীর কষ্ট দূর করতে চেষ্টা করতেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার রাজপুরসোনা-রপুরবারুইপুর অঞ্চলের ক্ষেপুদা- নিত্যানন্দ চৌধুরীর মত কমিউনিস্ট নেতাদের পরিচালনায় সলিল চৌধুরী, রঘু চক্রবর্তী ও অনিল ঘোষের মত তরুণরা সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েন। বামপন্থী রাজনীতির পথ দেখাতে এবং ত্রাণকাজে গিয়েছিলেন দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন সুন্দরবন, কাকদ্বীপ ও মেদিনীপুর জেলায়। সেই সময়ে কৃষকদের দুঃখদুর্দশা দেখে গণসংগীত রচনার কাজে তিনি হাত দেন।[১৩] সেইসব গান দলবেঁধে সলিল চৌধুরীরা গ্রামে-গঞ্জে গেয়েছেন। গণসঙ্গীত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের ধারার অনেকখানি অনুসরণ করেছেন। বিনয় রায়, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও অন্যান্য সংগীত-রচয়িতারা তেভাগা আন্দোলনের গান লেখেন স্থানবিশেষের গ্রাম্য ভাষায়। সলিল চৌধুরী তেভাগা আন্দোলনের পূর্বে ১৯৪৫ সাল থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথ্যভাষায় গণসংগীত লেখা শুরু করেন, তবে কিছু গ্রামীণ ভাষা প্রয়োজনে গানের কলিতে সার্থকভাবে মিশিয়ে দিতেন। লোকগানের আঙ্গিকে অন্যদের মতো গানগুলো লিখলেও তিনি স্বজ্ঞানে ভারতের অন্যপ্রদেশের বা বিদেশি সংগীত মেশাতে কসুর করেননি। কেবলমাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনেই গানকে নিবদ্ধ না করে উচ্চমানের সংগীত সৃষ্টির দিকেও যেন তিনি সমান নজর দিয়েছেন। যে-ব্যাপক সাংগীতিক জ্ঞান ও প্রতিভা নিয়ে তিনি গণসঙ্গীতের ক্ষেত্রে আসেন সেটা বিবেচনা করলে সলিল চৌধুরীর সৃষ্টিধর্মিতা বোঝা যাবে। ১৯৪৪ সালে যখন তরুণ সলিল তাঁর স্নাতক পড়াশোনার জন্য কলকাতায় আসেন, তখনই ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। এ সময় তিনি গান লিখতে এবং এর জন্য সুর করা শুরু করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক দলটি বিভিন্ন শহর এবং গ্রামগঞ্জে ভ্রমণ করতে থাকে, যা এই গানগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসে। 'বিচারপতি', 'রানার' এবং 'অবাক' পৃথিবীর মত গানগুলো তখন সাধারণ জনতার কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। কলকাতার ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেবার আগেই ১৯৪৫ সালে সলিল চৌধুরী তাঁর প্রথম গণসঙ্গীত সৃষ্টি করেন। [১৪]

কৃষক আন্দোলনের এবং তেভাগা আন্দোলনের গান রয়েছে মোটামুটি ছয়টি। তবে সেইসময় রচিত আরও অনেক গানে তেভাগা আন্দোলনের উল্লেখ বা ইঙ্গিত রয়েছে। এইসকল গানগুলিকে তিনি 'চেতনা ও জাগরণের

গান' বা 'The Mass Songs of Consciousness and Awakening' বলে সম্বোধন করেছেন।[১৫] মোটামুটি ১৯৪৬-৫০ এর সময়পর্বে তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন সলিল চৌধুরী রচিত গণসঙ্গীতগুলি ছিল মূলত তেভাগা আন্দোলন কেন্দ্রিক। এই সময় তিনি নিজের লেখা নিজের সুরে রচিত গণসঙ্গীত বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন শহর, বন্দর, গ্রামেগঞ্জে, সভায়, পথযাত্রায় গেয়ে বেরিয়েছেন। সেইসমস্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তেভাগা আন্দোলনের সাথে সম্যক ভাবে সম্পৃক্ত এবং কৃষকদের অনুপ্রেরনাদায়ি কিছু গানের আবেগের দলিলের বিষয়ে আলোকপাত করবো আলোচ্য প্রবন্ধে।

কৃষক আন্দোলনের সূচনা পর্বে ১৯৪৪ সালে তিনি যে গানটি রচনা করেন তখন অবশ্য তেভাগা আন্দোলনের সূচনা হয়নি। তবে আন্দোলন পর্বে এই গানটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।গানটি হলঃ

*"উর-র তাকা তাকা তাকা তাকা*
*তাঘিনা তাঘিনা ঘিনা ঘিনা রে-*
*উর-র জাগা জাগা জাগা*
*জাঘিনা জাঘিনা ঘিনা ঘিনা রে*
*গুরু গুরু মেঘের মাদল বাজে*
*তা তা থৈ থৈ মনের ময়ূর নাচে*
*আষাঢ়ের বরষা এলো*
*পরশে তারি রুক্ষ মাটি সরস হলরে*
*আয় লাঙ্গল ধরি মোরা লাঙ্গল চালাই*
*আয় ফসল বুনি মোরা ফসল ফলাই*
*আয় আয়রে আয়..."* [১৬]

- গানটি কৃষকদের মনে আসা ভরসা জাগাবার জন্যে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেয়।সমবেত কণ্ঠে গাইবার এটি ছিল উপযুক্ত গান।গানটির মাধ্যমে কৃষকরা যেমন নিজেদের সংগঠিত করার ভরসা খুঁজে পেয়েছিল তেমনই দিকে দিকে সমবেত ভাবে তারা গানটি গাইত।এই গানটি গণনাট্য সংঘে অন্যতম প্রথম দিকের রচিত হয়েছিল।লোকগানের সুরে ও তালে রচিত এই গানটির দুটি দিক আছেঃ এই গানের সুরের তালে ধান বোনা এবং বাঙালি কৃষকদের ফসল তলার উৎসব পালন।এই গানের হিন্দি সংস্করণও করা হয়েছিল "দো বিঘা জমিন" (Do Bigha Zameen) নামক হিন্দি ছায়াছবিতে, যার সুরকার ছিলেন স্বয়ং সলিল চৌধুরী নিজে।

বারুইপুর, সোনারপুর অঞ্চল সহ দক্ষিন ২৪ পরগণার বেশিরভাগ অঞ্চল প্রায়ই সময় বন্যার কারনে বৃষ্টিতে বানভাসি হত। বিদ্যাধরী নদীর বানভাসি অঞ্চলে কৃষকদের ওপর করা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ১৯৪৫-৪৬ সালে রচনা করেনঃ-

*"দেশ ভেসেছে বানের জলে ধান গিয়েছে মরে*
*কেমনে বলিব বন্ধু পরাণের কথা তোর*
*ঘরেতে ছাউল নাই পরনে পিরান নাই*
*অনাহারে দিবা নিশি ভাসি নয়ন লোরে*
*কেমনে বলিব বন্ধু পরাণের কথা তোরে..."* [১৭]

-গানটি কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এটিই সলিল চৌধুরীর প্রথম গণসঙ্গীত।তৎকালীন হরিনাভি, বারুইপুর, সোনারপুর অঞ্চলের কৃষকরা প্রবল ভাবে অনুপ্রানিত হয়েছিল তার এই গানে।এই গানের মাধ্যমে কৃষকদের দুর্দশা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনই কৃষকরা যে অন্যায়-অবিচারের শিকার সেকথাও তুলে

ধরেছিলেন।গানটি মূলত ভাটিয়ালি সুরে হলেও কোরাস অংশ 'মানবো না এ বিধান, মানবো না' মূলত স্লোগানধর্মী।তেভাগা আন্দোলনে এই স্লোগান চাষিদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তারা সমবেত ভাবে তা আন্দোলনে স্লোগান তুলতো।

তেভাগা আন্দোলনের সময় হরিধন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সলিলদা বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পার্টির কাজ করেছেন। দক্ষিণ বাংলার জেলাগুলো ছাড়া উত্তরবঙ্গেও গিয়েছিলেন ছাত্র সম্মেলনে।সেই সময়কার কৃষক আন্দোলনের সলিল চৌধুরীর আরেকটি গণসংগীত হলঃ-

*"কৃষক সেনাদের মুষ্টি তোলো আকাশে*
*যুদ্ধের ডাক শোনা ওই*
*তালে তাল একসাথে ডান বাম*
*একতারই হিম্মতে বলীয়ান*
*তারা ডাকে এক হও বলে ওই..."*[১৮]

- এই গানে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া আছে।গানটি রচিত **১৯৪৬** সালের গোড়ার দিকে। তেভাগার রনধবনি তখন বেজে গেছিলো বাংলার কিয়দংশে। কৃষকদের সংগ্রামে নামার ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের তাগিদেই এই গান। গণসঙ্গীতের গতানুগিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি এই গানটি এমন ভাবে পরিবেশন করেন যা থেকে হাজার হাজার জনতার কুজকাওয়াজ যেন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়।

গায়ক সলিল চৌধুরী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে সংযুক্তির পর গণসঙ্গীত রচনা, সুরারোপ, এবং গায়কের ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাংলা গণসঙ্গীতের সাংগীতিক ধারার সূচনা করেন।এই সময় তিনি একে একে রচনা করলেন কৃষকদের উজ্জীবিত করার গান। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা সুর দিয়ে সলিল চৌধুরী গান বাধলেনঃ

*"অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি*
*খুন হয়ে যায় সাদা সাদা ফেনা*
*ঘুমভাঙা দলবদ্ধ ঢেউয়ের*
*ক্ষুরধার তলোয়ারে..."*[১৯]

সলিল চৌধুরী তেভাগা আন্দোলনের সব থেকে জনপ্রিয় ও কালজয়ী গানটি রচনা করেন **১৯৪৭-৪৮** সাল নাগাদ স্বাধীনতার ঊষালগ্নে। যা কৃষক সমাজে ডেকে এনেছিল নতুন বিপ্লবের আহ্বান।গানটি নিম্নরুপঃ

*"হেই সামালো হেই সামালো*
*হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো*
*জান কবুল আর মান কবুল*
*আর দেব না আর দেব না*
*রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো..."*[২০]

-এই গানটি কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ ও অনুপ্রানিত করেছিল প্রবল ভাবে। গানটি নিঃসন্দেহে সলিল চৌধুরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকীর্তি।গানটিতে উঠে আসে তেভাগার জন্যে কৃষক মানসে নবজাগ্রত চেতনা। অবমানিত অথচ সংগ্রামী কৃষক সমাজকে উপজীব্য করে তোলে তেভাগা আন্দোলনআর তারই প্রেক্ষাপটে সলিল চৌধুরীর এই অসামান্য , সৃষ্টি তাদের মধ্যে সঞ্চার করে লড়াই করার তীব্র জেদ ও বাসনা। তেভাগা আন্দোলনের পত্তন কৃষকদের হাতে। তাই এই গান তাদের লক্ষ্যে সঠিক থাকার আহবান।গানটি সর্বত্র দেশবাসির মন জয় করে নিয়েছিল সম্যক

ভাবে।সম্পূর্ণ দেশজ সুরে মনমাতানো কথার ছন্দে দ্রুত লয়ে সমবেত কণ্ঠে গাইবার গান এই গান।এই গানটি তৎকালিন বাংলার গ্রামে গঞ্জে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।গানটি উপস্থাপনের জন্যে গণনাট্য সংঘের কাছে প্রায়ই আসতো আবেদন। সলিল চৌধুরী নিজেও দলবল নিয়ে দিকে দিকে গেয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন কৃষকদের। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত গান ছিল এই গান।গানে হাতির উল্লেখ চা বাগান অঞ্চলের কৃষক ও শ্রমিকদের অত্যাচারের কথাও স্বরণ করিয়ে দেয়।গানটি ইউরোপে ও বিশেষভাবে রাশিয়াতে জনপ্রিয়তা লাভ করে প্রবল ভাবে।রেবা রায়চৌধুরী এই গানটি সুইজারল্যান্ডের মাতৃ-সম্মেলনে গাইলে সারা ইউরোপে তার ডাকনাম হয়ে যায় 'হেই সামালো'।সলিল চৌধুরী এই জনপ্রিয় গানকে অনেক ছবিতে নানা ভাবে ব্যবহার করেছিলেন, যার মধ্যে একটি হল 'হারানের নাতজামাই'।[২১]

স্বাধীনতার পরও কতিপয় অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন চলেছে৷ কাকদ্বীপ, বড়াকমলাপুর, ডুবিরভেড়ি ইত্যাদি এলাকায় জোরদার আন্দোলন চলেছে৷ সেখানে কংগ্রেসী পাণ্ডা ও পুলিশ বাহিনীর অত্যাচার ছিল সীমাহীন৷ এসবের প্রতিবাদে সলিল চৌধুরী লিখলেন এক অনবদ্য গণসঙ্গীতঃ

*"ও আয়রে ও আয়রে*
*ভাইরে ও ভাইরে*
*ভাই বন্ধু চল যাইরে*
*ও রাম রহিমের বাছা ও বাঁচা আপন বাঁচা*
*চলো ধান কাটি, আর কাকে ডরি*
*নিজ খামার নিজে ভরি, কাস্তেটা শানাই রে*
*ঐ কমলাপুর বড়া*
*আর কাকদ্বীপ ডোঙ্গাজোড়া*
*এসেছে ডাক চলনা সবাই সোনা তুলি ঘরে..."*[২২]

- 'লাঙল যার জমি তার' জমিদারি প্রথা বিরোধী এই স্লোগানই গানের উৎস।নিজ খামার নিজ ভরার যে আনন্দ তার থেকে আমাদের দেশের কৃষক সমাজ যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত থেকেছে, তারই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন হল এই গান।সলিল চৌধুরীর সবচেয়ে জঙ্গি মনোভাবের এই মূল গানটি আন্দোলনে উদ্দীপনা জুগিয়েছিল।গানটিতে প্রতিবাদী বাণী প্রচারের সাথে সাথে সামপ্রদায়িক সমপ্রীতি বজায় রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে৷ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বম্বে অধিবেশনে সলিল চৌধুরী এই গানটিই গেয়েছিলেন।[২৩] পরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রেকর্ডে এবং সলিল চৌধুরী পরিচালিত 'ঘুম ভাঙার গান'- ক্যাসেটে গানটি প্রকাশিত হয়।

তেভাগা আন্দোলন চলাকালীন সলিল চৌধুরী লিখলেনঃ

*"ও ভাই চাষী ক্ষেতের মজুর, যতেক কিষাণ কিষাণী (সজনী)*
*এই বেলা নাও তেলেঙ্গানার পথের নিশানী।*
*আর এই মোরা রক্ত ঢেলে জমিন চষে পরগাছা পুষিলাম,*
*সেই পরগাছা হইল যে রাজা,*
*আর আমরা তারি গোলাম,*
*মরি হায় হায় হায় হায় রে*
*এবার আগাছা দাও নিড়ানি...(সজনী)"*[২৪]

-এ গান সলিল চৌধুরীর ব্যঙ্গাত্মক গান রচনায় দক্ষতার পরিচয় দেয়। বিদ্বেষবিরূপতা প্রকাশ করার এমন ভঙ্গি - আন্দোলনের সময়ে খুবই কার্যকরী হয়েছিল। এই গানের ব্যাঙ্গোক্তি ছাড়া ছন্দের দোলা ও শব্দের ঝংকার উৎকৃষ্ট মানের কাব্যগুণের সাক্ষ্য রাখে। গানটি দিলীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গণনাট্য সংঘের গানগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গণনাট্য সংঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক মন্টু ঘোষের কণ্ঠে গানটি ধৃত হয়েছে। তাঁর আকর্ষণীয় গায়কী এখনো গানটিকে জীবন্ত করে তোলে।

তেভাগা আন্দোলনের সময় সলিল চৌধুরী আরও লিখলেন। যদিও গানটি প্রকাশিত হয়নি।

*ধন্য আমি জন্মেছি মা তোমার ধূলিতে*
*"জীবন মরণে তোমায় চাই না ভুলিতে...*
*হিমালয় আর নিদ্রা নয়*
*কোটি প্রাণ চেতনায় বরাভয়*
*জাগো ক্রান্তির হয়েছে সময়*
*আনো মুক্তির খরবন্যা..."[২৫]*

তেভাগা নিয়ে সলিল চৌধুরীর সবথেকে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'শপথ' শীর্ষক কবিতাটি। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে পরিচয় পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।উত্তর স্বাধীনতা পর্বের সুবিখ্যাত তেভাগা অঞ্চল সুন্দরবনের কাকদ্বীপ।এখানে চন্দনপিঁড়ির তেভাগা মিছিলে রাইফেলধারী পুলিশ গুলি চালায় ৬ নভেম্বর ১৯৪৮। নিরস্ত্র সংগ্রামী যাঁরা প্রাণ হারান তাদের মধ্যে ছিলেন অহল্যা, বাতাসী, সরোজিনী, অশ্বিনী, গজেন এবং দেবেন। কৃষকবধু অহল্যা ছিলেন সন্তানসম্ভবা শহিদ। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদে তাঁর স্মৃতিতে সলিল চৌধুরী লিখলেনঃ

*"সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে*
*হরতাল হয়েছিল*
*সেদিন আকাশে জলভরা মেঘ*
*বৃষ্টির বেদনাকে বুকে চেপে ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিল*
*এই পৃথিবীর আলোবাতাসের অধিকার পেয়ে*
*পায়নি যে শিশু জন্মের ছাড়পত্র*
*তারই দাবি নিয়ে সারা কাকদ্বীপে*
*কোন গাছে কোন কুঁড়িরা ফোটেনি*
*কোন অংকুর মাথাও তোলেনি*
*প্রজাপতি যত আরও একদিন*
*গুটিপোকা হয়েছিল*
*সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে*
*হরতাল হয়েছিল...[২৬]*

সলিল চৌধুরী রচিত কবিতার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত ও দীর্ঘ কবিতা শপথ। এই কবিতার মাধ্যমে তিনি অহল্যা-মার দৃষ্টান্ত দিয়ে কৃষক আন্দোলন জোরদার করতে চেয়েছিলেন। বিষয়বস্তুর ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দ ও ছন্দের তারতম্য কবিতাটিকে আজও জীবন্ত করে তোলে। এই কবিতার অংশ বিশেষে সুর সংযোজন করে পাঠে ও গানে পরিবেশনের উপযুক্ত রুপ দেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা পাঠের ফাঁকে ফাঁকে কবিতার কলি সুরে গাওয়া হত। এই গানটি নানা সমাবেশে পরিবেশিত হয়েছে।গানটি গাওয়া হত পাষাণী অহল্যা নামেই। সলিল চৌধুরীর

লেখা অহল্যা গীতিনাট্য প্রায়ই মঞ্চস্থ করতো গণনাট্য সংঘ।গানটি ছিল চেতনা জাগরণের গান।তিনি পরে এই গানটি উত্তরণ অ্যালবামে রেকর্ড করেন।

গত শতকের চল্লিশের দশকে স্বদেশিকতার আন্তর্জাতিক আবহে সৃজনশীল বাংলা গণসঙ্গীতের সূচনা। স্বদেশি গানের উত্তরসুরী হিসেবে চল্লিশের দশকে পরাধীন ভারতবর্ষে একদল গণসঙ্গীতকার ও গায়ক ঐকান্তিক সাধনার ফসল রুপে চল্লিশের বাংলায় তেভাগা তথা কৃষক আন্দোলন, সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, অত্যাচার, অনাচারের বিরুদ্ধে সর্বোপরি গণমানুষকে উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্যে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এক সময় অনুষঙ্গের সাঙ্গীতিক ধারার বাংলা গণসঙ্গীতের উদ্ভব ঘটে।আর এই সাংগীতিক ধারার গণসঙ্গীতের প্রধান পথিকৃৎ ও রুপকার হলেন সলিল চৌধুরী মহাশয়। বাংলা গানে নতুন দিগন্ত নিয়ে এসেছিল সলিল চৌধুরীর গণসঙ্গীত।

সঙ্গীত গবেষকদের মতে, কোরাস বা সমবেত সঙ্গীত আগে গাওয়া হত একতানে, সলিল চৌধুরীই প্রথম সমবেত অর্কেস্ট্রার ব্যবহার করে অপূর্ব ছন্দ লয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে অনন্য ধারার সাংগীতিক আবহের সৃষ্টি করেন। সলিল চৌধুরী তাঁর সুরারোপিত গণসঙ্গীতের কথা ও সুরে শানিত অনুষঙ্গের সঙ্গে রোমান্টিকতাকে যুক্ত করেন অপূর্ব মাত্রায়।দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ ভারতের বিশেষ করে বাংলার গণমানুষের জীবনে চরম ভোগান্তির সৃষ্টি করেছিল।তেভাগার সংগ্রামে কৃষকদের করুন দশায় বিধ্বস্ত হয়েছিল তাঁর শাশ্বত মানব মন।এই প্রেক্ষিত মাথায় রেখে প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতকার সলিল চৌধুরী সৃষ্টি করেন এক অনন্য সাঙ্গীতিক ধারার গণসঙ্গীত।ভারতীয় সঙ্গীত জগতের প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পী নৌশাদ তাঁর স্মৃতি চারণায় সলিল চৌধুরী সম্পর্কে বলেন, 'তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমি তাকে চিনতাম, ওনাকে হৃদয়াঙ্গম করতে পারতাম। তিনি গানের মাধ্যমে জাগরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন।তিনি ছিলেন বিপ্লবের আরেক নাম'।[২৭] চল্লিশের দশকের গণসঙ্গীতের অন্যতম পুরধা হেমাঙ্গ বিশ্বাস এক সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন, 'সলিল চৌধুরী তাঁর সৃষ্ট গণসঙ্গীতে সাঙ্গীতিক দিকে খুবই নজর দিয়েছিলেন'। আধুনিক আঙ্গিকের গানও যে গণ মানুষের প্রানের সঙ্গীত হতে পারে তার নজির তৈরি করেন সলিল চৌধুরী'।[২৮]

পরিশেষে বলা যায়, সলিল চৌধুরীর তেভাগা আন্দোলনের কিছু গণসঙ্গীত আজও সভাসমাবেশে গীত হয়, কারন তাতে রয়েছে চিন্তা ও চেতনার সম্যক কালজয়ী উপাদান, রয়েছে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার রসদ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গান দেশকে দিয়েছিলেন তা আজও আমাদের জাতীয় সম্পদ হয়ে আছে। তেভাগা আন্দোলনের শ্লোগানগুলো ছিল মর্মস্পর্শী যেমন: 'লাঙল যার জমি তার', 'আধি নয়, তেভাগা চাই', 'জান দেব তবু ধান দেব না', 'দখল রেখে চাষ করো', 'ফসল কেটে ঘরে তোলো', 'কৃষক সমিতির জয়', 'জমিদারী প্রথা ধ্বংস হউক', 'কৃষকদের গান্ডি নাই', 'নিজ খামারে ধান তোলো', 'দখল রেখে ভাগ করো' গানের কলিতে স্থান পেয়েছিল এমন সব শ্লোগান।তিনি গণসঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন বিভিন্ন আন্দোলনে জোয়ারের জল এনে দেওয়ার জন্যে। তাঁর কোনো গানেই বিচ্ছেদ বা বিভেদ ঘটানোর কোনো চিহ্ন নেই। বরং তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বায়ক। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে কৃষকদের তেভাগার লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন তিনি। আর তারই ফলশ্রুতি এই সব কালজয়ী গণসঙ্গীতের সৃষ্টি।আজ সলিল চৌধুরী নেই, কিন্তু তাঁর অমর সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে তিনি যুগ যুগ ধরে অগণিত সঙ্গীতরসিকের চিত্তে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন একথা বলতে বাধা নেই।

**তথ্যসুত্র :**


১। *ভট্টাচার্য জয়ন্ত, 'বাংলার তেভাগাঃ তেভাগার সংগ্রাম', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৬,পৃঃ ১১।*

২। যে কৃষক সাধারণত নিজের লাঙল গরু দিয়ে নিজের খরচায় অপরের জমিতে চাষ, বপন, কাটাই ও মাড়াই করে উৎপন্ন ফসলের একটি ভাগ জমির মালিককে দেন এবং অবশিষ্ট অংশ নিজে নিয়ে থাকেন তাদেরকেই ভাগচাষী বা বর্গাদার বলা হয়ে থাকে।ভাগচাষী বা বর্গাদাররা সাধারণত উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকই জমির মালিককে দিতে

বাধ্য হন, তাই তাদের অপর নাম আধিয়ার, আর এই প্রথাকে বলা হত আধিপ্রথা। - Bose Sugata, *'Agrarian Bengal: Economy, Social Structure and Politics 1919-1947'*, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, Reprint, 2007, p. 249-50. দ্রষ্টব্য: রায় কৃষ্ণবিনোদ, *'চাষির লড়াই'*, ডিসেম্বর, ১৯৪৬,পৃঃ ২০।

৩। দাশ সুস্নাত, *'অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রামঃ তেভাগা আন্দোলন'*, নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা,২০১২,পৃঃ ১২।

৪। সেন সুনীল, *'ভারতের কৃষক আন্দোলন'*, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০,পৃঃ ৬৬।

৫। Bose Sugata , *Ibid*, p. 253.

৬। Majumdar Asok, *'Peasant Protest in Indian Politics: Tebhaga Movement in Bengal'*, NIB Publishers, New Delhi, 1993, p. 23.

৭। মুখোপাধ্যায় সুবোধকুমার, *'বাংলার আর্থিক ইতিহাস'*, কে.পি. বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, পৃঃ ৯২।

৮। গৌতম দীপঙ্কর, *'গণসঙ্গীত সংগ্রহ'*, শ্রাবণ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫, পৃঃ ৪-৫।

৯। বাগচি দীলিপ, *'গণনাট্য, গণসঙ্গীতঃ কিছু ভাবনাচিন্তা'*, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী (সম্পাঃ), *'দীলিপ বাগচি সারক গ্রন্থ'*, কলকাতা, ২০১৩, পৃঃ ৩৬৫।

১০। ঘোষ প্রদীপ, *'সঙ্গীতের গণধারায় গণসঙ্গীত'*, সমরেশ বসাক (সম্পাঃ), ঐক্যতান পত্রিকা, *বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩২*, পৃঃ ৪৩।

১১।'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' হল থিয়েটারশিল্পীদের সংগঠন। এটির লক্ষ্য ছিল- ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটানো। চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষে যুদ্ধের অভিঘাত থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সংকট, সাম্প্রদায়িকতার বিষচক্র, মন্বন্তরের করাল গ্রাস, সমস্ত পরাধীনতার সক্রিয় বিদ্রোহ, সাম্যবাদী চেতনার অন্তপ্রবাহ- এইসব মিলিয়ে যে উত্তাল প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল তা রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে নাটকে তুলে ধরাই ছিল এই সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য।১৯৪৩ সালের মে মাসে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পথ চলা শুরু। - রায়চৌধুরী সজল, *'গণনাট্য কথা'*, গণমন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ৩২-৩৩।

১২। চক্রবর্তী প্রবীর, 'রত্নগর্ভা সুন্দরবনের স্বরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তিত্ব', নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাঃ), *সমকালের জিয়নকাঠি পত্রিকাঃ সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা*, সুন্দরবন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১০, পৃঃ ৩৩৭।

১৩। রায়চৌধুরী সজল ও দাস সুবর্ণ, *'দক্ষিন চব্বিশ পরগণায় নাট্য আন্দোলনের গতি প্রকৃতি'*, অজিত মণ্ডল (সম্পা:), *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাঃ দক্ষিন ২৪ পরগণা সংখ্যা*, পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, *বর্ষ ৩৩, সংখ্যা ৩২-৩৬*, মার্চ, ২০০০, পৃঃ ৩১৮।

১৪। চক্রবর্তী শৈবালকুমার, *'বাংলার গান ও বাঙালির গান'*, সুপ্রিয় রায় (সম্পাঃ), *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাঃ বাংলা সংগীত সংখ্যা*, পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, বর্ষ ৩৭, সংখ্যা ৯, এপ্রিল, ২০০৫, পৃঃ ৫২।

১৫। Ganguly Ratul, *'Rally Songs and Poems From The Tebhaga Movement in Bengal'*, *Indian Journal of Social and Cultural Studies, Volume 2, Issue 8*, 2011, p.58.

১৬। গুপ্ত সমীরকুমার, *'সলিল চৌধুরীঃ প্রথম জীবন ও গণসংগীত'*, মিলেমিশে, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ ১১২।

১৭। রায় অনুরাধা, *'চল্লিশের দশকের বাংলায় গণসংগীত আন্দোলন'*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ৯২-৯৩।

১৮। গুপ্ত সমীরকুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬-১৭।

১৯।গণনাট্য, *সলিল চৌধুরী স্মরণ সংখ্যা*, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৫২-৫৩।

২০। রায় অনুরাধা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৫।

২১। গৌতম দীপঙ্কর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৬-৬৭।

২২। রায় অনুরাধা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭।

২৩। Ganguly Ratul, *Ibid*, p. 60.

২৪। গুপ্ত সমীরকুমার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯-২০।

২৫। গণনাট্য, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭-৫৮।
২৬। রায় অনুরাধা, 'তেভাগার গান ও কবিতা', দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পাঃ),'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাঃ তেভাগা সংখ্যা', পশ্চিমবঙ্গ সরকারঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৬, মে, ১৯৯৭, পৃঃ ১২৫।
২৭। *The Times of India*, New Delhi, 12th August, 2011.
২৮। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতা, ২ রা জুলাই, ২০০৮।

**External Links:**

IMBd: Salil Chowdhury [Link: https://www.imdb.com/name/nm0006005/] [Accessed on: 2nd June, 2018]

The World of Salil Chowdhury [Link: http://www.salilda.com/] [Accessed on: 27th May, 2018]

Wikipedia: Salil Chowdhuri [Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Salil_Chowdhury] [Accessed on: 22th May, 2018]